খসড়া, ১৯ অক্টোবর ২০২০, ঢাকা।

বিষয়: যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে ২২ অক্টোবর রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় টেকসই সহায়তা বিষয়ক দাতসংস্থাসমূহের সম্মেলনের প্রাক্কালে সিসিএনএফ'র অবস্থান

১। **আমরা রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থাসমূহের ভূমিকার প্রশংসা করি, তবে আমরা তাদেরকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের প্রয়াসকে দ্বিগুন জোরালো করার অনুরোধ করছি, কারণ এটিই একমাত্র স্থায়ী সমাধান।** রোহিঙ্গা সমস্যা একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পরিণত হচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে টেকসই সহায়তা বিবেচনায় নিয়ে এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য সিসিএনএফ (কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম) দাতা / ধনী / উন্নত দেশগুলিকে সাধুবাদ জানায়। তবে, এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং অন্যান্য নানা সমস্যায় ভুগছে, রোহিঙ্গার মতো সমস্যার জন্য বাংলাদেশ কোনভাবেই দায়ী নয়। ২০২০ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই প্রায় ২৫ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ আইপিসিসির পূর্বাভাস অনুসারে এই বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা হয়ে যাবে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। বিশেষত কক্সবাজারেই রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র, বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য নির্মিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুনর্বাসন কেন্দ্র, আর এই কেন্দ্রের বেশিরভাগই এসেছেন সাগরের বুকে হারিয়ে যেতে থাকা কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা–কুতুবদিয়া থেকে। কোভিড ১৯ মহামারী দেশটির দারিদ্র্যের হার ৩০%–এ নিয়ে গেছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আয় কমিয়ে দিয়েছে ২০%। দীর্ঘমেয়াদী বন্যার কারণে দেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলের ফসলসহ অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি করেছে, খাদ্য ঘাটতি সহ আরও কিছু সংকট দেখা দিয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা ছাড়া বাংলাদেশের এসব মানবিক ও উন্নয়ন সমস্যার প্রতি জাতিসংঘ এবং আইএনজিওগুলোর আগ্রহ এবং এসব সংকট মোকাবেলায় এদের উদ্যোগ অপ্রতুল।

২। **সরকারের সাথে ইতিবাচক সম্পৃক্ততা থাকতে হবে, ব্যবসা বা নব্য ঔপনিবেশিকতা নয়, উন্নয়ন সহযোগিতার লক্ষ্য হতে হবে ক্ষমতায়ন।** দাতা, জাতিসংঘ এবং আইএনজিওদের অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে যে– উন্নয়ন কার্যকারিতা বা গ্রান্ড বারগেন চুক্তি স্বাক্ষর করার পরেও বাংলাদেশে অর্থ সহায়তার পরিমাণ কতটা এসেছে, অন্যদিকে প্রযুক্তি ও দক্ষতা স্থানীয়দের কাছে কতটা হস্তান্তরিত হয়েছে, শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়দের কতটা অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদানের জন্য মুখে মুখে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া হলেও, বাংলাদেশের সহায়তায়, বিশেষ করে কক্সবাজার জেলার উন্নয়নে জাতিসংঘ এবং আইএনজিওগুলোর খুব কমই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘ এবং আইএনজিও নেতারা যদি বাংলাদেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন, তবে তাদের অবশ্যই বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে তাদের নিজ নিজ দেশগুলিতে মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগের প্রচেষ্টা দ্বিগুন করতে হবে, মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে মায়ানমার খুব দ্রুত তাদের নাগরিককে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, কারণ এই প্রত্যাবাসনই একমাত্র টেকসই সমাধান। অর্থ সহায়তা স্থানীয়দের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত, কিছু অর্থ খাদক নতুন এনজিও তৈরি করার জন্য নয়। অর্থ সহায়তার উদ্দেশ্য হতে হবে স্থানীয় সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করা, যারা রোহিঙ্গা সংকটের একেবারে শুরুতেই ত্বরিৎ সাড়া দিয়েছিলেন। এমনকি সাম্প্রতিক মহামারীতেও তারা তাদের নিজস্ব অর্থ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে স্থানীয় সেই সিএসওদের দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চলছে এবং 'দক্ষতা উন্নয়ন' নামের তথাকথিত ঔপনিবেশিক ধারণাগুলো সামনে এনে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা নেই বলে পরিকল্পিত এবং সমন্বিত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন

সেক্টরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেই অতিথি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং আইএসসিজিতে এদের কোনও প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। মানবিক কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে স্থানীয় সিএসওদের, কারণ জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ ও আইএনজিওগুলো তাদের দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষিত কর্মীদের ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কর্মীদের বেতন বেড়েছে ২৩৬% পর্যন্ত, যা টেকসই স্থানীয় সিএসওগুলির বিকাশে কোনভাবেই অনুকূল নয়। বিভিন্ন উপায়ে, আমরা এই সমস্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, তবে কোনও সাড়া পাইনি। মনে হচ্ছে যেন সবকিছুকেই 'অর্থ সহায়তার বাণিজ্য'-এর জন্য উপযোগী করে পরিচালনা করা হচ্ছে। আমরা ব্যাপকভাবে হতাশ, কারণ আমরা দেখছি যে- রোহিঙ্গা সংকট চলাকালেই কিছু উন্নত দেশ গত কয়েক বছরে মিয়ানমারের সাথে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক দ্বিগুণ করেছে, মিয়ানমার সরকারের সাথে অস্ত্র ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করতে তাদের সম্ভাব্য সব রকম উদ্যোগই নিতে হবে, অন্যথায় তাদের অবশ্যই এই শরণার্থীদের তৃতীয় কোনও দেশে পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমাদের সরকারের সাথে ইতিবাচকভাবে এই বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

৩। **পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদেরকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় 'নিচ থেকে উপরে যাওয়ার বা 'বটম-আপ' পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, সংকট মোকাবেলায় রোহিঙ্গা প্রতিনিধিসহ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।** অর্থ সহায়তার পরিমাণ ক্রমশ কমে যাওয়ায় রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনায় খরচ কমিয়ে আনতে হবে, আর এ জন্য প্রয়োজন স্থানীয়করণ। স্থানীয়করণের একটি রূপরেখা চূড়ান্ত করতে জাতিসংঘের নেতৃত্বের প্রায় ২ বছর সময় লেগেছে, এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেওয়া ইউএন এজেন্সিগুলিগুলোর উপর আমরা কিভাবে আস্থা রাখতে পারি? রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে সাম্প্রতিক সহিংসতা আমাদের এও বলে যে, সমস্ত পরিকল্পনাকে শান্তি বজায় রাখা এবং সামাজিক সংহতির সাথে সমন্বিত করতে হবে, এবং এটিকে হতে হবে বটম আপ পদ্ধতির। স্থানীয় এনজিও / সিএসও-র স্থানীয় কর্মীরা, স্থানীয় সরকার এই খরচ কমিয়ে এনে রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা করতে পারে, এবং স্থানীয়রা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ভালভাবে জানে বলে তারা সামাজিক সংহতি ও শান্তি গঠনের যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতীতে যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা বা জেঅরপি প্রণয়নে স্থানীয় এনজিও / সিএসও, স্থানীয় সরকার এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই অপ্রতুল। আমরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি তবে আমরা সর্বস্তরে শক্ত প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছি। শুরুতে, আমরা শীর্ষ নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রদূত এবং দাতাদের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছি, এমনকি আইএসসিজি নেতৃবৃন্দ আমাদের আমন্ত্রণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী / স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন, তবে বর্তমান আইএসসিজি নেতৃবৃন্দ এই ধরনের সমস্ত সুযোগ ও পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

৪. **সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে যৌথ নেতৃত্বাধীন একটি একক ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্ব প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি যে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘ সংস্থাসমূহকেও যৌথভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে।** বিশেষ করে ইউএনএইচসিআর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, কারণ সংস্থাটি শরণার্থীদের ব্যস্থাপনার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থা। সুতরাং, একটি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে তহবিল ব্যবস্থাপনার মাধ্যম হিসেবে একটি একক কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত, যাতে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা যথাযথভাবে, কোনও অপচয় ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি আইএনজিওসহ জাতিসংঘের বেশিরভাগ অঙ্গসংস্থার অর্থ সহায়তার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আইএসসিজি সম্পৃক্ত, কিন্তু যেসব আইএনজিও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ সহায়তা পায়, তাদের সেসব অর্থ বা তহবিলের হিসাব আইএসসিজি প্রক্রিয়ায় খুব কমই

আসে। শুরু থেকেই সিসিএনএফ এই একক ব্যবস্থাপনার অনুরোধ করছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই ধরনের একক কোনও ব্যবস্থাপনার মাধ্যম না থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা এবং অপচয় রয়ে গেছে। কোভিড ১৯ মহামারীকালীন সময় জাতিসংঘের সংস্থা, বিশেষত ইউএনএইচসিআর এবং আইওএম-এর উদ্যোগের আমরা প্রশংসা করি, তাদের প্রচেষ্টার কারণে, রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে সংক্রমণের হার কম ছিল, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীও এতে উপকৃত হয়েছে।

৫. **টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলোর বিকাশে পুল ফান্ড এবং প্রত্যক্ষ অর্থায়ন করুন।** এসইজি (স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ, ইউএন দ্বারা গঠিত, ইউএনআরসি, ইউএনএইচসিআর, এবং আইওএম এর কো- চেয়ার) কর্তৃক গঠিত লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স ইতিমধ্যে টেকসই প্রতিক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলির বিকাশে একটি পুল ফান্ড এবং স্থানীয়করণের চালিকা শক্তি প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছে । আমরা এমন এনজিওগুলির বিষয়ে কথা বলছি যারা অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে মানবাধিকার / শরণার্থী অধিকারের প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দীর্ঘমেয়াদে, এ জাতীয় স্থানীয় নাগরিক সমাজকে কেবল প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত পরিষেবার জন্যই নয়, নিপীড়িতের কথা তুলে ধরতে এবং মানবাধিকারের ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার এবং সামাজিক শক্তিগুলোর সাথে এদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। যেমনটি আমরা আগেও অনুরোধ করেছি যে, জাতিসংঘ এবং আইএনজিওগুলিকে মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মধ্যেই তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ করা উচিত, তাদের অবশ্যই প্রতিটি বিদেশি কর্মীর জন্য প্রযুক্তি হস্তারের সময়সীমা বেধে দিতে হবে। বিদেশি নিয়োগ হতে হবে চাহিদার ভিত্তিতে, সরবরাহ করার তাগিদ থেকে নয়।

৬. **জনমনের দ্বন্দ্ব-সন্দেহ দূর করতে অর্থ সহায়তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস করার অবিরাম চেষ্টা করতে হবে, খরচ কমানোর অনেক সুযোগ রয়েছে।** রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কত টাকা এসেছে এবং বাস্তবে তাদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কত টাকা খরচ হয়েছে গেছে তা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি রয়েছে। আমরা স্বীকার করি সেখানে অনেক ভাল কাজ হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিশাল পরিচালন ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি রয়েছে। সিসিএনএফ ইউএনওচা'র ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেমের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একটি গবেষণা চালিয়েছে। গবেষণা দেখা গেছে যে, জেআরপি'র আওতায় ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২.৬ বিলিয়ন অর্থ সহায়তা এসেছে, এই পরিমাণটিকে হিসাব করলে প্রতি মাসে প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য বরাদ্দ এসেছে প্রায় ৪২৩ ডলার। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, এনজিও চ্যানেলের মাধ্যমে আসা অর্থগুলি এই ফাইন্যান্সিয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। এই কারণেই আমরা অনুরোধ করছি যে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একটি একক লাইন এবং একক কর্তৃপক্ষ থাকা উচিৎ। আমরা সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করে দেখেছি যে, প্রতি রোহিঙ্গা পরিবার কার্যত ১৩০ ডলারের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা পেয়েছে। বাকি অর্থ শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা, নারী সুরক্ষা, এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ সাধারণ পরিষেবা এবং পরিচালন ব্যয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র অর্থ সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারিনি। সিসিএনএফ ইতিমধ্যে খরচ কমিয়ে আনার প্রচুর প্রস্তাব দিয়েছে।